RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - VI , Paper - I
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya.

Analysis of North Indian Musical Forms

B) KIRTON

'কীর্তন' বাংলার অতি প্রাচীন এক ভক্তি সঙ্গীতের ধারা । এই ধারা বাংলার নিজস্য সম্পদ। ভারতীয় অভিজাত বা ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত ধারার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হল কীর্তন। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের এলা-প্রবন্ধ (প্রকীর্ণ) গানের রূপ ও বৈশিষ্ট্য এতে সম্পূর্ণ রূপে বিদ্যমান।

কীর্তন শব্দটি সংস্কৃত 'কৃৎ' ধাতুর সঙ্গে 'অনট্' প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন। যার অর্থ হল গুণবর্ণনা, যশঃপ্রচার, ঈশ্বরের নাম, গুণ, যশোকথা-আবৃত্তি ও গানের মাধ্যমে বর্ণন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন - 'নাম গুণ লীলাদি উচ্চৈভাষা তু কীর্তনম্' । ঈশ্বর এখানে শ্রীকৃষ্ণ। কীর্তনে মূলত শ্রীকরষ্ণেরই গুণকথা ও লীলাবর্ণন করা হয়। এই গানে ভক্তিরসেরই প্রাধান্য। এই সঙ্গীতে সুরের সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব কবিদের যেমন - জয়দেব, বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস প্রমুখের পদাবলীতে সুরারোপ করে কীর্তন গাওয়া হয়। ভগবদ্ ভক্তিই এই সঙ্গীতে প্রধান।

কীর্তনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভক্তি এবং প্রেমে। এর প্রয়োগ কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য নয়, ভগবৎ প্রেমে শ্রোতার মনকে সিঞ্চিত করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। কীর্তনকে শুধু গীত বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এই বিষয়কে ভক্তি সাধনের উপায় রূপেই গ্রহন করেছিলেন এবং বর্তমানেও বৈষ্ণব সাধকের কাছে কীর্তন প্রধান অবলম্বন।

বাংলা কীর্তনের মূল উৎস ও তার বিকাশ তথা বিবর্তনের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের ভুমিকাটি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কীর্তন গান বিকশিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীকে ঘিরেই। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলীকে মোটামুটি তিনটি শাখায় বিভক্ত করা যায়। যথা -

১) শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্ত্তী পদসাহিত্য ও সঙ্গীত ।
২) শ্রীচৈতন্য সমকালীন পদসাহিত্য ও সঙ্গীত ।
৩) শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী পদসাহিত্য ও সঙ্গীত ।

১) শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্ত্তী পদসাহিত্য ও সঙ্গীত

প্রাক্ চৈতন্য যুগে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি শ্রীমদ্ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণাদি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে অসংখ্য কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। এছারা চৈতন্যপূর্ব্বের জয়দেবের গোস্বামীর গীতগোবিন্দ, বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য, রায় রামানন্দের সংস্কৃত নাটকের গানগুলিতে প্রায়শই স্থানে স্থানে পদাবলীর সুর ধ্বনিত হয়েছে। পদাবলী সঙ্গীতের সুরের অনুরনণ এই সমস্ত কাব্যে আভাসিত রয়েছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাবন্ধিক বৈশিষ্ট্য, গায়কীভঙ্গি, রাগ-রাগিনী প্রভৃতি চর্য্যা যুগ থেকে গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পথ বেয়ে বাংলা কীর্তনে প্রবেশ করেছে একথা সুনিশ্চিত।

২) শ্রীচৈতন্য সমকালীন পদসাহিত্য ও সঙ্গীত

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপ ধামে হয়েছিল। এই সময়টিই ছিল বাংলার সর্ব্বাঙ্গিন নবজাগরণের সূচনা ক্ষণ। বাংলা পদকীর্তনের জন্ম ও বিকাশ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও নামসংকীর্তনের জনক ও স্রষ্টা শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ কীর্তনের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর পূর্ব্বযুগে বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত বিভিন্ন বৈষ্ণব

পদাবলী থেকে। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর সার্থকতা একমাত্র কীর্তন গানে। পদাবলীর সাহিত্যমূল্য ও কাব্যরস যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন , কীর্তন গানের বাইরে পদাবলী সহিত্যের কোন বিশেষ স্থান নেই।

শ্রীচৈতন্যদেব হলেন বাংলা নামসংকীর্তনের জনক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সামাজিক ভেদ-বৈষম্যের ঊর্দ্ধে উঠে সকল মানুষকে এক ভাব , রসে ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হলে দলবদ্ধ ভাবে মহানাম সংকীর্তনের প্রোজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। তিনি বলেছিলেন, সকলে মিলে উচ্চস্বরে শ্রীভগবানের (শ্রীকৃষ্ণের) নামোচ্চারণ, জয়ধ্বনি ও গুণ বর্ণনা করার মধ্যেদিয়ে অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রূপ নামসংকীর্তনকে তিনি সামাজিক উৎসবে পরিনত করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত এই নামসংকীর্তনের ধারা সেইসময়ে ধর্মীয় আবেগের আকারে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আপামর জনসাধারণ অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শ্রীহরির নামসংকীর্তনে অবতীর্ন হন। জাতির ভেদ-বৈষম্য দূর হয়ে গিয়ে মানুষ মানুষকে মঙ্গলসূত্রের জয়মালায় অভিনন্দন জানাতে পেরেছিল একমাত্র এই নামসংকীর্তনের দ্বারাই। ছোঁয়াছুঁয়ির শুচিবায়ু দূর হয়ে এক মঙ্গলশঙ্খের আহ্বানে সকল মানুষ কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়েগিয়েছিল। ওই সময় শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করেই বঙ্গ সংস্কৃতির পুর্ণাঙ্গ পরিবর্তন ও বিকাশ হয়েছিল।

৩) শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী পদসাহিত্য ও সঙ্গীত

শ্রীচৈতন্যদেব স্বর্গ ও মর্ত্তের রখীবন্ধন ঘটিয়েছিলেন তাঁর প্রচারিত নামসংকীর্তনের মাধ্যমে। তাই তিনি ভক্তবৃন্দের কাছে ‘ভগবান স্বয়ম’। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারানির যুগল তত্ত্বের সন্মিলিত রূপ। তাই তাঁর দেহাবসানের পর তাঁর জীবনলীলাকে কেন্দ্র করে রচিত হয় গৌরলীলা কীর্তন এবং গৌরচন্দ্রিকা।

শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাভাবের স্ফুরণ হয় দাক্ষিণাত্য ভ্রমনের পরেই। পুরীধামে ফিরে এসে তিনি তাঁর পার্ষদদের নিয়ে কীর্তন গান শুরু

করেন এবং তখনি জন্ম নেয় পদকীর্তন বা রসকীর্তন। এইরূপ গান তিনি কেবলমাত্র তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায় রামানন্দ, রূপ-সনাতন, স্বরুপ দমোদর, মুরারী গুপ্ত প্রমুখ বৃন্দাবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত সঙ্গীতবিদ্‌দের সঙ্গে বসে একান্তে করতেন। তিনি এই কীর্তন গানে নতুন করে প্রান প্রতিষ্টা করেন এবং এই রীতিকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করার সুবিধার্থে সহজ রাগ ও তাল যুক্ত করেন। তাই সেই সময় থেকে বাংলায় কীর্তনের সমাদর তুঙ্গে ওঠে। সেই সময় খেতুরীর বৈষ্ণব মহামহোৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠ কীর্তনের চারটি ঘরানা বা ধারা এবং এই চারটি ধারায় বহু গুনীজন বহু কীর্তনের পদ রচনা করে সমাজে প্রচলন করেন এবং সেই সঙ্গীতের রঙে বাংলার আকাশ বাতাস রঙিন হয়ে ওঠে। সেই ধারা আজো পূর্ণ গৌরবে বহমান।

**To be continued in the next set.